যায়যায়দিন

তারিখ 2 4 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

একজন শিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন আমি শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে জড়িত। তাই শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের বিষয়গুলো আমার শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। শিক্ষাঙ্গনের ভালোমন্দ আমাকে ছুয়ে যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষাঙ্গন সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি অংশ। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা অস্থিতিশীলতার প্রভাব শিক্ষাঙ্গনেও পড়ে।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এ প্রভাব এখন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে শিক্ষাঙ্গনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। সে কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর জন্য ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক, পলিটিশিয়ান সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করে আমাদের সন্তানদের একুশ শতাব্দীর যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আমাদের সময়কার শিক্ষাঙ্গন ছিল সত্যিই আনন্দদায়ক। সুন্দর, শান্ত ও নির্মল শিক্ষার পরিবেশ, ঘনিষ্ঠ ও উন্নত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, নিয়মিত পড়াশোনা, খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক চর্চা, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে হলে ফিরে আসা- এগুলো ছিল তখনকার শিক্ষাঙ্গনের বৈশিষ্ট্য। এসবই শিক্ষার পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলো ,যদি আবার ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে আমার বিশ্বাস, ছাত্ররা আর বিপথগামী হতে পারবে না।

আমাদের সময়ের তুলনায় বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়েনি। ফলে আগের তুলনায় একজন শিক্ষককে বেশি সংখ্যক ছাত্রকে পড়াতে হচ্ছে। সে জন্য সব ছাত্রের সঙ্গে একজন শিক্ষকের ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যারা মেধাবী কিংবা গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদের সঙ্গেই শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বদলেছে, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তনের প্রভাব ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করছে। ফলে ছাত্ররা শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও আজকাল আসছে না। কিছু শিক্ষক ও কিছু ছাত্র শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়ে জড়িত থাকায় স্বার্থ বা আদর্শজনিত কারণে তাদের সম্পর্কে অবনতি হচ্ছে। বাস্তবেও হয়তো সেটাই ঘটছে। কিন্তু এ সংখ্যা নিতান্তই কম। বিচ্ছিন্ন ঘটনা টেনে এনে বলা যাবে না যে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ধস নেমেছে।

তবে সমাজের সবার মধ্যে দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহিষ্ণুতা দায়িত্ববোধ গড়ে উঠলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে যে অভিযোগ এখন উঠছে সেটাও থাকবে না। এক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রসুলভ গুণাবলি থাকতে হবে, তাহলে শিক্ষক তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। অন্যদিকে শিক্ষককের মধ্যেও শিক্ষকসুলভ গুণাবলি থাকতে হবে। তাহলে ছাত্ররা তাকে শ্রদ্ধা করবে।

ছাত্ররা এ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ। এখানে ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন হবে ঠিকই কিন্তু সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত থাকবে এটা অনভিপ্রেত। বিশেষ কোনো অবস্থায় তারা প্রতিবাদ করতে পারে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে শিক্ষার ক্ষতি হয়। ছাত্ররা দেশের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য সর্বোপরি নিজেকে গড়ে তোলার জন্য কাজ করবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে কেন কাজ করবে? দেশ, সমাজ ও পরিবার তাদের কাছে দায়িত্ব সচেতন নাগরিকের ভূমিকা আশা করে। সেই ভূমিকা পালনের জন্য তাদেরকে নীতি ও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। ছাত্রদের সব সময় মনে রাখতে হবে, যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য লেখাপড়া ও গবেষণাই হচ্ছে মূল কাজ।

শিক্ষা ও রাজনীতি দুটি ভিন্ন বিষয়। ছাত্রজীবনে এ দুটি একসঙ্গে চলতে পারে না। একই অবস্থা শিক্ষকদের বেলায়ও। কিছু শিক্ষককে দেখা যায় রাজনীতিতে জড়িত থাকতে। কোনো কোনো সময় তারা ছাত্রদেরও এ কাজে ব্যবহার করছেন। এটাও অনুচিত। ছাত্রদের নিয়ে কিছু পলিটিশিয়ান ও শিক্ষক যেভাবে মাতামাতি করে যাচ্ছেন তেমনটা বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

আমি মনে করি, আমরা যে যেখানে আছি সেখানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা উচিত। একজন ছাত্রের যেমন দায়িত্ব পড়ালেখা করা, তেমনি একজন শিক্ষকের দায়িত্ব আছে গবেষণা করা, বেশি বেশি প্রবন্ধ লেখা। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে রাজনীতি করার সময় পাওয়া যেতো না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার হওয়া উচিত। উন্নত দেশগুলো যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তির জ্ঞানের মশাল নিয়ে সুদূর মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত ধাওয়া করছে তেমনি আমাদেরও তাদের সঙ্গে সমান তালে না হোক এগিয়ে তো যেতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার একটি স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করতে হবে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েকে পৃথক না করে সবার জন্যই তা অবৈতনিক করা উচিত।

শুধু নাম স্বাক্ষর জানার মধ্যে শিক্ষিতের সংজ্ঞা সঙ্কুচিত করে রাখা ঠিক হবে না। অন্যদিকে শুধু উচ্চ শিক্ষিত লোক বাড়িয়ে তোলাও ঠিক নয়। এক্ষেত্রে আমাদের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আরো প্রফেশনাল, আরো বাস্তবমুখী হওয়া উচিত। সে জন্য পেশাভিত্তিক শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। তা না হলে হাজার হাজার এমএ পাস ছাত্র বের হবে কিন্তু চাকরি দেয়া যাবে না, অথবা চাকরি পেলেও দেখা যাবে তার চাকরির সঙ্গে একাডেমিক বিষয়ের কোনো মিল নেই। তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে সরকারের এতো টাকা নষ্ট করে কেন সে উচ্চ ডিগ্রি নিলো?

সে জন্য উচ্চ শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে তার শিক্ষাটা পেশা জীবনের কাজে লাগে। তার লব্ধজ্ঞান যেন অব্যবহৃত থেকে না যায়।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর
কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি।

সংশোধন